বেগম খোরশেদা বানু

খান ফাউন্ডেশন ও
দি মিলেনিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারপারসন

বেগম খোরশেদা বানু তৎকালীন ঢাকা জেলার নারায়নগঞ্জ মহকুমার নরসিংদী থানাধীন বেলাব গ্রামের ঐতিহ্যবাহী ডেপুটি বাড়ীর সন্তান, যে গ্রামটি এখন নরসিংদী জেলার সদর থানার অন্তর্ভূক্ত। তাঁর পিতা মরহুম জনাব আবদুল গফুর ছিলেন তৎকালীন সময়ে এ অঞ্চলে প্রথম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, যিনি এলাকায় ডেপুটি সাহেব নামে সমাধিক পরিচিত ছিলেন। বেগম খোরশেদা বানু ছিলেন আট ভাই বোনের মধ্যে দ্বিতীয় এবং বোনদের মধ্যে বড়। ডেপুটি সাহেব তাঁর আদরের বড় মেয়েকে বুড়ি বলে ডাকতেন। ছোট বেলা থেকে তিনি খুব মেধাবী, মিশুক, পরোপকারী ও বিনয়ী ছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চ শিক্ষার সুযোগ তাঁর তেমন না থাকলেও সেই যুগে তিনি ক্লাস এইট পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। তিনি ছিলেন ঢাকার বিখ্যাত ইডেন স্কুলের ছাত্রী, যে স্কুল ভবনটি এখন বাংলাদেশ সচিবালয় হিসেবে ব্যবহৃত ও পরিচিত। শিশু কাল থেকেই তার বইয়ের প্রতি দুর্বলতা ছিল খুব বেশি। এ প্রসঙ্গে ডেপুটি সাহেব বলতেন, আমার এই মেয়েকে যদি আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে পারতাম, তাহলে ও আমার সকল সন্তানদের চেয়ে পরীক্ষায় ভাল ফল করত। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় ইংরেজি ও বাংলায় অসংখ্য বই পড়েছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি পৃথিবীর নোবেল লরিয়েটসহ বিখ্যাত মনীষিদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কর্মগুলো অধ্যয়ন করেছেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের ডাক ও তার বিভাগের মহাপরিচালক ও পি. এম. জি. জনাব নাসিরউদ্দিন আহম্মদের ছোট বোন এবং প্রফেসর গিয়াসউদ্দিন আহম্মদ, প্রফেসর ডাঃ রশিদউদ্দিন আহম্মদ এবং প্রফেসর ফরিদা বানু ও প্রফেসর সাজেদা বানুর বড় বোন।

১৯৪২ সালে তিনি মরহুম জনাব আবদুল মোমেন খানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, যিনি পরবর্তীকালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের খাদ্যমন্ত্রী (১৯৭৭-৮২) ও মন্ত্রীপরিষদ সচিব (১৯৭৬-১৯৭৭) ছিলেন এবং বাংলাদেশে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে নরসিংদী সদর থেকে জাতীয় সংসদ সদস্য (১৯৭৯-৮২) নির্বাচিত হয়েছিলেন।

বেগম খোরশেদা বানু ছিলেন আদশ গৃহিণী ও একজন রত্নগর্ভা মা, এক ছেলে এবং দুই মেয়ের গর্বিত মাতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর ও বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মন্ত্রী ও এমপি ডঃ আবদুল মঈন খানের মত ছেলেকে গর্ভে ধারণ করেছেন তিনি। অধিকন্তু তাঁর দুই মেয়ে ফওজিয়া বেগম ও ডঃ সেলিমা বেগম উভয়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। তাঁরা বর্তমানে কানাডা এবং আমেরিকাতে কর্মরত।

আত্মীয়স্বজন, ভাইবোন এবং প্রতিবেশীদের প্রতি তার ছিল গভীর আন্তরিকতা। তাঁর সংস্পর্শে এবং আদর্শেই গড়ে তুলেছেন তার ভাইবোন ও সন্তানদের। শুধু আপন ভাইবোন নয়, চাচাতো, মামাতো, ফুপাতো ভাই বোন, দেবরদের অনেককেই তিনি আপত্য সন্তানস্নেহে লালন করেছেন, প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনদের জন্য তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ।

তিনি শুধু একজন মা-ই ছিলেন না। তিনি ছিলেন শিল্প স্বত্ত্বায় বিকশিত একজন সুচারু শিল্পী। অবসর সময়গুলো তিনি বিভিন্ন ধরনের পুতুল তৈরি, পোষাক ডিজাইন, এমব্রয়ডারী, নক্সীকাঁথা ও সূচী শিল্পে নিয়োজিত থাকতেন। পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন আতিথিপরায়ণ রন্ধন শিল্পী। নিয়মিতভাবে আমন্ত্রিত রাষ্ট্রদূতেরা তাঁর ঐতিহ্যবাহী রান্না খেয়ে বলতেন, এ বাড়ী হচ্ছে রাজধানীর শ্রেষ্ঠ কিচেন। অন্যদিকে তিনি ছিলেন একজন ভ্রমণ পিপাসু পর্যটক। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, কানাডা,

সৌদি আরব, ভারত, নেপাল, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, সিংগাপুর সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণে তিনি অনাবিল আনন্দ লাভ করতেন। এমনকি তিনি ছিলেন একজন পারদর্শী দাবা খেলোয়াড়ও।

সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের কথা বিবেচনা করে ১৯৮৮ সালে ধ্বংসাত্মক ও প্রলয়ংকরী বন্যায় আক্রান্ত অসহায়, নিঃসম্বল মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টায় মরহুম জনাব আবদুল মোমেন খানের স্মরণে প্রতিষ্ঠিত খান ফাউন্ডেশন ও পরবর্তীতে খান ফাউন্ডেশনের পৃষ্টপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত দি মিলেনিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারপারসন যে প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠার জন্মলগ্ন থেকে তার পুত্রবধু এডভোকেট রোখসানা খন্দকার কর্তৃক সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আয় বৃদ্ধিকারী কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রদের উঁচু মানের বাস্তবধর্মী শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়াই এ প্রতিষ্ঠানসমূহের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের একটি বিশেষ দিক হচ্ছে মহিলা ও শিশুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, যারা আমাদের দেশে সব চাইতে অবহেলিত ও অনুন্নত জনগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত। বেগম খোরশেদা বানু তাঁর মোমেনবাগস্থ নিজস্ব আবাস স্থল খান ফাউন্ডেশন ও দি মিলেনিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহারে চিরদিনের জন্য প্রদান করে গেছেন। শুধু তাই নয়, নিজ গ্রাম বেলাবোতে তাঁর পুত্র ডঃ আবদুল মঈন খান কর্তৃক প্রস্তাবিত ও প্রদত্ত অর্ধ কোটি টাকারও অধিক সরকারী আর্থিক অনুদানে প্রতিষ্ঠিত শহীদ গিয়াসউদ্দিন গার্লস হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠালগ্নে শহীদ বুদ্ধিজীবী ভ্রাতার নামকরণের শর্তপূরণে ও পরবর্তীতে স্কুলের উন্নয়নে আরও জমি পদান করেন যার বর্তমান মূল্যমান অর্ধ কোটি টাকারও অধিক।

এই মহীয়সী নারী ২০১১ সালের ১ জুলাই শুক্রবার সুবেহ সাদেকের সময় ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর প্রতি এলাকাবাসীর ছিল এক গভীর শ্রদ্ধাবোধ। তাই তাঁর দাফনের জন্য যখন তাঁর লাশ পলাশের চরনগরদী গ্রামে নেওয়া হয় তখন তাকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনে মানুষের ঢল নেমেছিল। তাঁর জানাযার সময় অঝোর বৃষ্টি উপেক্ষা করেও উপস্থিত হয়েছিলেন হাজার হাজার মানুষ।